অরুণকুমার চক্রবর্তীর অন্য ভাবনা
কবিতার জন্মবিজ্ঞান, একটি কবিতার অনুষঙ্গ

('লাল পাহাড়ির দেশে যা'র ৪০ বছর সংযোজিত)

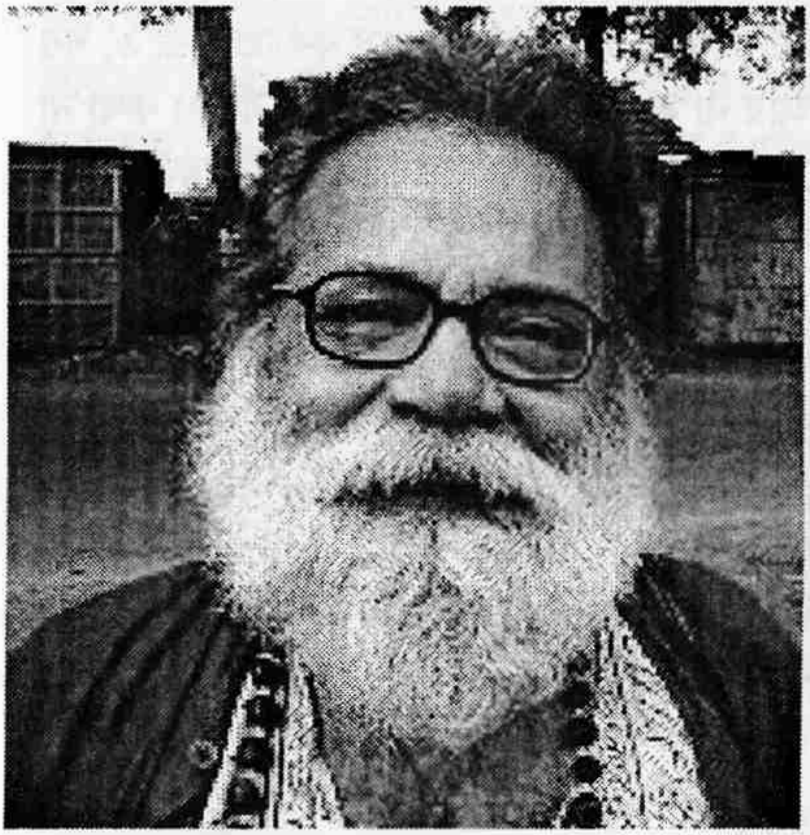

প্রবহমানতার নির্মম মধুর আঘাতে বা মমতায় নির্মিত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অগুনতি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের সামান্যতম কিছু সঞ্চয় যখন শব্দের ছবিতে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়, তাকেই আমি কবিতা বলতে চাই। এই ভাস্কর্যের ব্যাপ্তি মাপতে যাওয়া বড় ভুল। তা কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য, কখনও স্বাদিত, কখনও অনাস্বাদিত, কখনও সীমিত, আবার কখনও সীমাহীন এবং তা সহজ মনে হয়ে উঠলেও জটিলতম, জটিলতম হয়ে সহজ সরল অথবা দুইয়ের অসাধারণ সমন্বয়। তারই প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বিভায় আলোকিত একটি ব্যক্তিমানুষ যখন কিছু ছবি আঁকেন এবং তা মুদ্রিত হয়ে মানুষের কাছে উপস্থিত হয়, তখনও কবিতার সংজ্ঞা পাবে কিনা, তাও যেন আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তবে এ সৃষ্টির অন্তরালে যে বিজ্ঞানটুকু কেন্দ্রস্থ হয়ে আছে, তাকে স্বীকার করবে কে?

এই বিজ্ঞানকে যেন তিনটি পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি বলে মনে করছি। এই তিন পর্যায়কে যদি এইভাবে ভাগ করি, তবে কার্যত কারোর আপত্তি থাকতে পারে বলে মনে করি না; যেমন—এক Nucleation, দুই Growth, তিন Transmigration। Nucleation পর্যায়টিকে বলতে চাই কবিতার বীজতলা, যা নৈঃশব্দের কাজ করে যায়। যে কোন ভাবনা,— যা নাকি আনন্দ, শোক, বিরহ, দৃশ্যবীক্ষণা, হতাশা, অবক্ষয়, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, শোষণ, অসাম্য, ভালোবাসা, ভালোবাসাহীনতা ইত্যাদি জাত, তা এই Nucleation-এর জন্য মূলত দায়ী। অর্থাৎ সচেতন, অসচেতন বা অবচেতন মনের বাদায় বীজ হ'য়ে পরিপূর্ণতার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, উক্ত বীজ যখন অচেতন বা অবচেতন মনে নিষিক্ত, তখন কি ক'রে পরবর্তীকালে কবিতার জন্ম দেবে? কারণ, জন্ম দেবে বলেই দেবে—এই বীজ মনোবিজ্ঞানের রহস্যময়তার আড়াল থেকে সচেতন মনে

উত্তীর্ণ হয়ে তবেই সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয় এবং তা করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা', নজরুলের 'কার শিখী পাখার লেখনী', রামপ্রসাদের 'ইচ্ছাময়ী তারা' তারই জীবন্ত উদাহরণ। তাছাড়া স্বপ্নজাত বহু ঘটনাই তো পরবর্তীকালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয়ে উঠবে, এ খবর তো আমরা রাখি। Nucleation পর্যায়ের যে আরোহণ, অবরোহণ বা আলোড়ন অন্তরের অন্তরকে নাড়িয়ে দিয়ে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে, তাকে বলবো Growth পর্যায়। এখানে মজা এই, Necluation পর্যায়েই অনেক সময় অবলুপ্তি ঘটে যেতে পারে—সব বীজই অঙ্কুরিত না হওয়ার মতোই ঘটনা। যাই হোক, Growth পর্যায়ে একটি নিজস্ব আকার গড়ে ওঠার একটা ব্যাপার থাকে, সময় থাকে, এই সময়টুকুর ব্যাপ্তি বা বিস্তার সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে না। —একটি ভাবনার বীজ কতক্ষণ বা কতদিন পরে অঙ্কুরিত হয়ে সত্যকার ফসল ফলাবে, তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম থাকছে না। বহুদিনের লালিত ভাবনা অনেক অনেক দিন পরে ফসল ফলিয়েছে, এ ঘটনাও বিরল নয়। আবার তাৎক্ষণিক দৃশ্যপুষ্ট ভাবনা ও পরম ফসলের প্রাপ্তি তো পৃথিবীর প্রথম কবি বাল্মীকির মধ্যেই ঘটে গেছে। সেক্ষেত্রে ওই তিন পর্যায়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এত অল্প যা অলৌকিক, আশ্চর্য এবং প্রোজ্জ্বল শাশ্বত। আবার Growth পর্যায়ে যে ফসল ফলবেই, তার কোন নিশ্চিন্ততা নেই। পরিপূর্ণ অবয়বের আকার নেয় ওই পর্যায়েই। এতক্ষণ সব ঠিক ঠিক থাকলেই তৃতীয় পর্যায়ে পদক্ষেপণ শুরু। এবং তা Transmigration পর্যায়ে। তখন শব্দের দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়ানো। তারপর বুদ্ধি, আবেগ, নিজস্বতা, প্রয়োগ, ব্যঞ্জনা, দক্ষতা এবং পরিবেশন বিজ্ঞান সমন্বয়ে শব্দ-স্তম্ভ আমাদের সামনে কবিতা হয়ে শোভা পায়। এবং এখানেও নিশ্চিন্ততা নাও থাকতে পারে, একথা ভুলে গেলে চলবে না এবং মনে রাখতে হবে দ্বন্দ্ব থাকেই প্রতিক্ষেত্রে, আর যে ধ্বন্যাত্মক অন্তরীণ শক্তি সৎ ফসলের জন্ম দিচ্ছে, তাকে আমরা চিরকালই আবাহন করবো।

এবার একটু উদাহরণ দেবার চেষ্টা করি। অন্তত যা আমাদের ক্ষেত্রে বারবার ঘটে চলেছে। এবং ঘটবে বলে বিশ্বাস করি। একটি গাছ। নাম তার মহুয়া। ইংরেজিতে Madhuka Latifolia—যা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা বা মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে পর্যাপ্ত দেখেছি। এই গাছের সঙ্গে বনবাসী মানুষদের কোথায় যেন একটা আন্তরিক যোগাযোগ আছে। এর পাতার আগুনে ওরা শীত আড়াল করে। ফুলের গন্ধে ভেঙে পড়ে সাগরের ঢেউ, গানে গানে কল্লোলিত হয় অরণ্যনির্জন। এ গাছ ওদের বড় আদরের। ওর ফলও ওরা খায়।

এই রকম একটি গাছ শ্রীরামপুর স্টেশনে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখেছি। যেখানে শব্দের অসহ্য দামামা। লক্ষ লক্ষ মানুষের তাৎক্ষণিক দাপট নিয়ত। ট্রেনের হাঁস্‌ফাঁস্। হকারের দাপাদাপি, দূষিত ধুলোর থাবা। অসহ্য দুপুর। টোপা টোপা মহুয়া ফুলের ভারে অলংকৃত দেখে মুহূর্তের মধ্যে আমার অরণ্যের কথা মনে হল। অরণ্যবাসীদের কথা মনে পড়ে গেল। এটা কি Nucleation পর্যায় নয়?

এরপর আমার কেমন কষ্ট হতে লাগল। স্পর্শগন্ধ রয়েছে বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করলো। শব্দটি 'বেমানান'। আমার মতোই কিংবা আর সবাইকার মতোই গাছটি যেন ঠিক জায়গায় নেই। আমরা যে যার আপাত স্বস্থানে অত্যন্ত বেমানান। যার যেখানে থাকার কথা নয়, সে যেন ঠিক সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। যেন তার চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয় ছিল। অথবা আমরা মৃত হয়েও আসন্ন এক সুন্দর জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি স্বস্থানে স্বাধিকার

পাবো বলে। এভাবেই দশটি ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছে—ভাবনার মধ্যে বিস্তার ঘটে চলেছে—আমাকে যেন কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না, আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধছে। হে পাঠক, এটা Growth পর্যায় নয় বলে একেবারে অস্বীকার করতে পারবেন?

একটি সৎ ফসলের জন্ম ঘটাতে অন্তর্লীন শক্তির বিক্রিয়া তখন কোষে কোষে ঘটাচ্ছে বিপর্যয়, আলোড়ন। ভ্রূণ থেকে শিশুর অবয়ব ঘটে গেছে গর্ভাধারে। সে যে আলো চায়। পৃথিবীতে আসতে চায়, গর্ভফুলের কোরকের অসহ্য অন্ধকার আর ভাল লাগছে না—সে আসবেই, প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মে সে প্রকাশিত হবেই আপন মাধুর্যে। পাথরে পাথরে বহন করে যাচ্ছে অসহ্য তৃষ্ণা, চাই চাই তৃষ্ণা যে মেটানো চাই। অরণ্য ভর করেছে, বনবাসীদের নিটোল কালো কালো মুখগুলি আমার চারপাশে। কি চায়? পাতায় পাতায় বেজে উঠছে আদিম মাদল গান। নৃত্যমুখর পায়ে পায়ে ভেঙে যাচ্ছে হাজার সাগরের ঢেউ, কতগুলো স্নায়ু ছিঁড়লো? আর কত বাকি? কষ্ট যে আর সহ্য হয় না। বড্ড কষ্ট হে, বড্ড কষ্ট। শব্দ চাই, শব্দের রঙ চাই। সাদা ক্যানভাস কই? অরণ্য, শব্দ দাও। মাদল সুর দাও। লেখার তুলি দাও। কবিতা—এবার জন্ম নাও। কবি প্রস্তুত। পাঠক, তুমি? হে প্রবহমানতা, তোমার শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের ছিঁটেফোঁটা আমাকে অর্পণ করো। শব্দের ছবিতে ওকে লালন করবো। আমাকে মুক্তি দাও।

জন্ম নিল কবিতা...। পাঠক, তোমার অধিকার বুঝে নাও এবারও...।

।। শ্রীরামপুর ইস্টিশনে মহুয়া গাছটা।।

হাই দ্যাখো গ' তুই ইখানে কেনে, লালপাহাড়ির দেশে যা
রাঙা মাটির দেশে যা
হেথাকে তুকে মানাইছে নাই গ', ইক্কেবারেই মানাইছে নাই
অ-তুই লালপাহাড়ির দেশে যা...
সিখান গেলে মাদল পাবি
মেইয়ে মরদের আদর পাবি
অ-তুই লালপাহাড়িরর দেশে যা
লারবি যদি ইক্কাই যেতে
লিস্ না কেনে তুয়ার সাথে
নইলে অ-তুই মরেই যা
ইক্কেবারেই মরেই যা
হাই দ্যাখো গ', তুই ইখানে কেনে, লালপাহাড়িরর দেশে যা
রাঙ্গা মাটির দেশে যা,
রাঙা মাটির দেশে যা...।

অনুলেখ :

এই মহুয়া গাছ আমার মধ্যে যে বিস্ফোরণ ঘটালো,—অন্য কবির মধ্যেও বিস্ফোরণ অন্যভাবে ঘটাতে পারে, একথা অনস্বীকার্য। যে কবি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তার স্বস্থান

থেকে সত্যকার আত্মপ্রকাশ ঘটুক সৎ রুচিশীল সাহিত্যচর্চার, উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই তাই।

সংযোজন : ১. খুব ছোটো বয়স থেকেই একটা নিদারুণ বহেমিয়ান চরিত্রের (super tramp) সাবলীল ছায়া কেবলই আমাকে তাড়া করে ফিরছিল—যে ছায়া হয়তো নিজেরই এক অন্য ছায়া যাকে আমি আজও খুঁজে চলেছি। প্রকৃতি, মানুষ, বাউল, জীবনবোধ, সংসার, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ, সঙ্গীত, অ্যাডভেঞ্চার, বিজ্ঞান, তন্ত্র, অরবিন্দ দর্শন, চৈতন্যদেবের ভাববাদ, প্রেম, আকুলতা, মাওবাদ, রামকৃষ্ণের অসাধারণ সোস্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট, কবিতা-শিল্প-সাহিত্য এবং সর্বোপরি কঠিন বাস্তব আর ব্রহ্মচর্য পালনের ইতিকথার প্রতি সুতীব্র আকর্ষণের আর অন্বেষণের মায়াজাল আমার মগজটা কেবল যেন গুলিয়ে দিয়েছিল। জিজ্ঞাসা আর জিজ্ঞাসা, কৌতুহল। মরুতীর্থ হিংলাজের লেখক অবধূতের কাছে তন্ত্র শিখতে বা জানতে গিয়ে একদিন আবিষ্কার করলাম মা কালীর হাতের রক্তাক্ত কাতানের সঙ্গে আমাদের বাংলা ভাষার জিজ্ঞাসা চিহ্নের অদ্ভুত মিল। জানি না ওই কাতানের ডিজাইনটা কে করেছিলেন? কেনই বা এত মিল? অর্থাৎ কোথায় যেন একটা রহস্য রয়েই যাচ্ছে। উত্তর কলকাতায় মামার বাড়ি। বাড়িতে কালীমূর্তি। অমাবস্যায় বলি, সেই কাতান। এক কোপে বলি। রক্ত। মাংসের প্রসাদ। প্রথম প্রথম কষ্ট হতো খুব। পরে পরে সব সয়ে গেল। কাতান ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছি। তাতে দু-দিকে দুটো টানা টানা চোখ খোদাই করা। তার সঙ্গে মা কালীর কপালে আঁকা চোখের সঙ্গে মিল। পরে জেনেছিলাম, ওটা তৃতীয় নয়ন (Third Eye)। বড়োদের প্রশ্ন করি। কেউ কিছু বলতে পারে না। মা বলেছিল, তৃতীয় নয়ন হলো জ্ঞানচক্ষু। জ্ঞান হলে ওই চক্ষু খুলে যায়। ওটা দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানে থাকে। দেখা যায় না, কিন্তু আছে। ব্যাস ওইটুকু। অর্থাৎ প্রশ্ন। মগজে ওইটুকু বয়সেই (৭) হাজারো প্রশ্ন। কাতান জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন আর প্রশ্ন। পরে জানলাম, চোখ দিয়ে দেখো, প্রশ্ন করো। অনেক পরে টিবেটিয়ান সায়েনটিস্ট ড: রামসাম লামার 'দা থার্ড আই' পড়ে কিছুটা জানা হলেও বোধের উঠোন অন্ধকার।

অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে দেখা আর প্রশ্নের অনাবিল আনন্দে। দেখতে দেখতে প্রশ্ন করতে করতে মানুষের অন্তরে বাহিরে নিরন্তর রক্তপাতের শেষ নেই। এ যেন অনন্ত অভিজ্ঞতার সহজিয়া প্রকাশ। কাতানের গায়ে লেগে থাকছে রক্তের আলপনা বিন্যাস। একদিকে দেখার নেশা, অন্যদিকে প্রশ্নের অনন্ত ধারাপাতের দৃশ্য-অদৃশ্য টান, মানুষকে জাগিয়ে রেখেছে।

এভাবেই দেখার নেশার তাগিদে ছুটে যাওয়া কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর, সোমনাথ থেকে কোহিমা, আন্দামান নিকোবর, হিমালয়ের অন্দরে অন্দরে। সঙ্গে প্রশ্ন তো তাড়া করবেই। সব উত্তর মিলছে না। উত্তর মেলে না। কিছুতেই মেলে না। চরম সংসারী থেকে গুহাবাসী সন্ন্যাসী আকাশচারী ঋষির (Astral traveller) মুখের শুধু অনাবিল হাসি। আর প্রশ্ন সব বোঝানো যাবে না। নিজেকেই বুঝে নিতে হবে। নিজেই চিনি খেয়ে দেখতে হবে, ঠিক ঠিক মিষ্টতা কাকে বলে। দেখতে দেখতে কখন যে অন্বেষণ, প্রশ্ন, বিচার শুরু হয় মানুষও ঠিক জানে না। তারপর নির্মাণ বা সৃষ্টির কথা আসে, হয়, অলক্ষ্যে থাকে বিজ্ঞান। পৃথিবীর যেকোনো সৃষ্টি বা নির্মাণের অন্তরালে থাকে Nucleation, Growth আর Transmigration প্রণালীর বিজ্ঞানময় অধ্যায়ধারা। রামায়ণের Nucleation-এ রাম, মহাভারতের Nucleation-এ ভারতের সর্বকালীন রাজনীতি, কুটনীতি, বীরত্ব, দর্শন, ত্যাগ, যুদ্ধ, রক্তপাত।

রায়ের বাড়ি, শুশুনিয়া পাহাড়, ইন্দাস, ছান্দার, জামবেদিয়া, ভীমপুর রাণীবাঁধ, সুতান, ঝিলিমিলি, কুইলাপাল, বান্দোয়ান, দুর্গাপুর ব্যারেজের জলে নৌকাভ্রমণ, রাতুরিয়ার শ্মশানে আড্ডা, সঙ্গে বিখ্যাত লেখক শঙ্কু মহারাজ। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে কবিতা পাঠের আসরে জমজমাট আড্ডা, আঞ্চলিক কবিতার উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকনির্ণয়।

বেলিয়াতোড়ে কলম্বাস পত্রিকার আসরে আলাপ হলো তখনকার উঠতি গায়ক বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে। ও তখন মান্না দে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গান গেয়ে বেড়াচ্ছে মঞ্চে মঞ্চে। আমার আঞ্চলিক কবিতাগুলি শুনে বাঁকুড়ার লোকজন প্রচণ্ড উৎসাহিত। মানুষের কথা কবিতায় লিখি বলে, বাঁকুড়ার মানুষের মুখের কথায় কবিতা লিখি বলে, ওরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে 'মানুষের কবি' হিসেবে আমাকে সম্মানিতও করে বসলো। সুভাষের মধ্যে উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ভেবে কবিতার সুর আরোপণের কথা বলতেই প্রচণ্ড উৎসাহে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নাজিম হিকমৎ, শঙ্খ ঘোষ, জীবনানন্দ দাশ, আমার আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি কবিতায় সুর দিয়ে ফেললো। মঞ্চে মঞ্চে গান, উৎসাহ পায়, ১৯৭৮ সাল, আমার প্রথম কবিতার বই 'অরণ্য হত্যার শব্দে' প্রকাশ পেল। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত লেখা কবিতাগুলি কুড়িয়ে বাড়িয়ে জমা করে শিশুসাহিত্যিক কার্তিক ঘোষের চেষ্টায় আর আমার পরম অগ্রজ বন্ধু পঞ্চাশের দশকের কবি শ্রদ্ধেয় রমানাথ চট্টোপাধ্যায়ের (কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সনৎ চট্টোপাধ্যায়েরও বন্ধু) উৎসাহেই আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। বেশ মজা লেগেছিল। এখানে একটু অহংকার করতে পারি। তখনও পরিবেশ চেতনা আসেনি। সারা ভারতের জঙ্গলমহল ঘুরতে ঘুরতে গাছ কাটতে কাটতে জঙ্গল কমে আসার দৃশ্যপট আমাকে 'অরণ্য হত্যার শব্দে' (Echoes of Murdering the Forest, পরে বন্ধু বাঁশবেড়িয়ার পিনাকী চক্রবর্তী অনুবাদ করেছিল) লিখতে বাধ্য করেছিল। ১৯৬৮ সালেই লিখেছিলাম ওই কবিতা। আর 'শ্রীরামপুর ইস্টিশনে মহুয়া গাছটা' কবিতাটিও কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল।

৪. ১৯৭৩-৭৪ সালেই লালপাহাড়ির সুরারোপণ হয়ে গেল। মঞ্চে মঞ্চে সুভাষ গায়। খনি অঞ্চলে সাঁওতাল পাড়ায়। আমি জানতাম, আরও একজন কবি, কবি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (আসানসোলের কাছে রূপনারায়ণপুরের বাসিন্দা) আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা লেখেন। সুভাষের সঙ্গে আর কবি অরুণদার সঙ্গে যোগাযোগের ঘনত্ব বাড়াতেই প্রস্তাব দিলাম, দুজনের কবিতা গান গেয়ে রেকর্ড করলে কেমন হয়। সুভাষ রাজি। অরুণদাও রাজি। সুভাষকে নিয়ে চলে গেলাম ভি বালসারাজির কাছে। তিনি তখন ইনরেকো (কলকাতার অক্রুর দত্ত লেন) কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। সুভাষের মুখে গান শুনে বেশ চমকিত হলেন। নতুনত্বের স্বাদ পেলেন। ফোকগানের একটা যে বাজার আছে, মানুষ শুনতে চায়, কোম্পানির খুব একটা ক্ষতি হবে না মনে করে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। তখন আমার দুটো আর অরুণদার দুটো কবিতা দুর্গাপুজোর আগেই রেকর্ড হয়ে গেল। Extended Play (E.P), 45 r.p.m সারা বাংলা, আসাম, ত্রিপুরায় হইচই পড়ে গেল। হু হু করে বিক্রি হতে লাগল রেকর্ড। দেশ-এ, আনন্দবাজার-এ, অমৃত পত্রিকায়, যুগান্তরে ভূয়সী প্রশংসা ছাপা হলো। সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড! ১৯৭২ সাল থেকেই কবিতাটি কয়েক হাজার বার পাঠ করেছি। তার ওপর গানের রেকর্ড—বাউলদের কানে পৌঁছালো যেই, ওরাও গাইতে লাগল। আখড়ায়, সভায়, সমিতিতে, মাউন্টেনিয়ারিং ক্যাম্পে ক্যাম্পে, কবিতার আড্ডায়, কবিতার পাশাপাশি

গোয়েরনিকার Nucleation-এ ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের ইতিবৃত্ত। গীতাঞ্জলির Nucleation-এ অসাধারণ আত্মনিবেদনের সঙ্গীতময় গীতলতা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

২. গত শতাব্দীর ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই দশকে এমন একটা সময় ছিল, যখন হাওড়া থেকে বরাকর যেকোনো স্টেশনে নেমে পড়লে দু-একটা দিন আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারতাম। বন্ধুরা ফুলওয়ালা, ফলওয়ালা, টিটি, কুলি, পুলিশ অফিসার, জি আর পি, মাস্টারমশাই, মদওয়ালা, আশ্রমিক, বাউল, চাষি, কবি, মাছওয়ালা, সন্ন্যাসী, মাতাল, চোর, আপাত পাগলের দল। তেমনি ১৯৭২ সাল এপ্রিলের শেষাশেষি নাগাদ ভরদুপুরে শ্রীরামপুর স্টেশনে হঠাৎ নেমে পড়েছিলাম। ওখানে অনেক কবিবন্ধু থাকে। আড্ডার টান। ভাঁড়ে চা খাচ্ছি। ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে কাটোয়া লোকাল গেল। ভীড়। কয়লার গুঁড়ো। আপ স্টেশনের শেষে একটা গাছ। আবার একটা থ্যাবড়ামুখো বুড়ো ইঞ্জিন নিয়ে অমৃতসর এক্সপ্রেস চলে গেল। এখন স্টেশন বেশ ফাঁকা। আবার চায়ের ভাঁড়ে চুমুক। চারদিকে খাঁ খাঁ করছে রোদ্দুর। গরম। হঠাৎ একটা অতি চেনা গন্ধে মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে উঠলো। আহা! বড় চেনা গন্ধ, প্রাণের গন্ধ, মাতাল-করা গন্ধ—যেন অন্তরের সুবাস, বাতাসে ফুরফুরে উড়ছে। প্রথম দেখলাম আপ স্টেশনের শেষে মহুয়া গাছ। একটাও পাতা নেই। সারা গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ ঝুমকো ফুল, মাটিমুখী, খলখল হাসছে। নীচে দাঁড়াতেই মাটিতে ছড়ানো টোপা টোপা মহুয়াফুল, পায়ের চাপে চটকে গেছে। তখন আমি আর আমাতে নেই। উবু হয়ে বসে টোপা টোপা মহুয়াফুল কুড়িয়ে খেতে লাগলাম। তখন আমি আর মহুয়া গাছ। পাশে কেউ নেই, স্টেশন নেই, মানুষ নেই—কেউ নেই, কেউ নেই। কতক্ষণ কাটলো জানি না। সম্বিত ফিরে পেতেই দেখি আমাকে ঘিরে ৪০/৫০জন মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছে। অনেক মুখ চেনা, চাওয়ালা, ফলওয়ালা, যাত্রীদের মুখ। ওরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে—অরুণদা, অরুণবাবু, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, মিস্টার চক্রবর্তী, পাগল হয়ে গেলেন নাকি? নাহলে অমন করে নোংরা প্ল্যাটফরম থেকে মহুয়াফুল কুড়িয়ে খান? একটু হাসিও পেল। তখন পকেট থেকে রুমালটা বের করে বাঁ-হাতে মেলে দিয়ে ফুল কুড়িয়ে রাখতে রাখতে বেশ হাসি পেল। সুরিন্দর চাওয়ালা বললে, স্যার, ঠিক হো তো? আমার ডান হাতে সুরিন্দরের চায়ের ভাঁড়। বাঁ-হাতে রুমাল পুঁটলিতে বন্দী মহুয়ার ফুল। মাঝে মাঝে গন্ধ নিই। চা খাই। বাঁ-হাতে মহুয়ার ফুল আর ফুল নেই, মদ হয়ে গেছে। বাংলার 'আমোদ' আর 'প্রমোদ' শব্দদুটির পাশাপাশি আর একটি নতুন শব্দ মগজে জন্ম নিল—'চা-মদ'। চা-মদে ঢালিয়া দিনু মন...। শ্রীরামপুর স্টেশনে মহুয়াগাছ দেখা হলো, আবিষ্কার হলো। এবার প্রশ্ন হলো, এই গাছ এখানে কেন? ওর তো বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ধলভূমগড়, ফুলডুংরি, নেতার হাট, ডুংলুং নদির ধারে, ডাকাইছানি, ভীমটেকায় থাকার কথা। কোন্ রসিকজন ওকে এখানে বসালো? এখানে ওকে একদমই মানাচ্ছে না। যার শিক্ষকতার যোগ্যতা নেই, সে শিক্ষক। যার ডাক্তার হবার কোনো যোগ্যতা নেই, সে ডাক্তার! যার মন্ত্রী হবার যোগ্যতা নেই, সে মন্ত্রী! কাউকেই যেন কোথাও-ই মানাচ্ছে না। প্রশ্ন উঠে আসে মগজে : 'হাই দ্যাখো গ', তুই ইখানে কেনে? হেথাকে তুকে ইক্কেবারেই মানাইছে নাই...'।

৩. ১৯৭০ সাল, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টে সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড। বহেমিয়ান অরুণ উড়ে বেড়াচ্ছে। ডাকাইছানির জঙ্গল, সোনামুখি, বেলিয়াতোড়, যামিনী

গান—যেন জমাট ব্যাপার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে, সন্তু মুখার্জী সিনেমায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নাটকে, ভৈরব গাঙ্গুলীর যাত্রায়, টিভি সিরিয়ালে, টেলি-ফিল্মে, লোকগানের কম্পিটিশনে, নাচে, ডান্স বাংলার প্রতিযোগিতায় (মিঠুন চক্রবর্তীর অনুষ্ঠানে) বাউল মেলায়, পৌষমেলায়, বসন্ত উৎসবে, শান্তিনিকেতনের কলাভবনের আড্ডায়, ক্যামেলিয়া হোটেলের লাউঞ্জে, আমেরিকায়, বৃটেনে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, সাউথ আমেরিকায়, থাইল্যাণ্ডে, জাপানে, কোরিয়ায়, নেদারল্যাণ্ডে, কানাডায়, বাংলাদেশে, লণ্ডনের ওয়েবসাইটে, ট্রেনে, বাসে, অল ইণ্ডিয়া ইন্টার ইউনিভার্সিটির গানের উৎসবে—এন.সি.সি-র ক্যাম্প ফায়ারে... লালপাহাড়ির মাদকতা মানুষের হৃদয়ের মাঝখানে কোথায় যেন একটা স্থায়ী স্থানাঙ্ক পেয়ে গেল। আশির দশকে শান্তিনিকেতন কলাভবনে ছাত্র পরাগ রায়ের নেতৃত্বে অল ইণ্ডিয়া ইউনিভার্সিটির ফোকলোর ফেস্টিভালে 'লালপাহাড়ি' গেয়ে বিশ্বভারতী পেয়ে গেল গোল্ড মেডেল। কীর্ণাহারের অভিজিৎ গুপ্ত অল ইণ্ডিয়ার এন সি সি ক্যাম্পে, ক্যাম্প ফায়ারের অনুষ্ঠানে 'লালপাহাড়ি' গেয়ে পেল বেস্ট পারফরমেন্সের জন্য শ্রেষ্ঠ ট্রফি। বোলপুরের নিমাই দাস বাউল একদিন একটা নতুন সবুজ রঙের হিরো সাইকেল চেপে আমার বাড়ি এসে বলল, 'গুরু, তোমার গান গেয়ে শ্রেষ্ঠ গায়কের প্রাইজ এই সাইকেল'। চন্দননগরের পৃথা সারা বাংলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় 'লালপাহাড়ি' আবৃত্তি করে পেয়ে গেল ফার্স্ট প্রাইজ। রেডিও সম্প্রচারণ করল। ত্রিবেণীর বিশ্বনাথ অধিকারী, অন্ধ গায়ক, ট্রেনে 'লালপাহাড়ি' গাইতে উষা উত্থুপের নজরে এলে উষা উত্থুপ বিশ্বানথের প্রথম ক্যাসেট করে দিলেন। নিজেও গাইলেন। এখনকার ভূমি ব্যাণ্ড গানটা প্রায় চুরিই করলো। টিভি-র অনুষ্ঠানে প্রচার হলো। অরুণের নাম বলে না দেখে ভূমির অনুষ্ঠানে গ্রামে গঞ্জে, শহরে, কলেজের সোস্যালে প্রতিবাদ উঠল। এখন ওরা মানতে বাধ্য হয়েছে। এভাবেই হাজারো ঘটনা ঘটে চলেছে দশক দশক ধরে—সে বড়ো মজার। ঝুপড়ি থেকে ফাইভস্টারে 'লালপাহাড়ির'-র সুর উড়ছে।

৫. রবীন্দ্রনাথ বলতেন, সহজ কথা কইতে আমায় কহ যে, সহজ কথা যায় কি বলা সহজে, তখন মনে হয়, এই তো বলতে পারলাম। সহজ কথা, সহজ সুর, সহজ বাণী, তখন মনে হয় ৫০ বছরের বাক্যচর্চায় একটি কবিতাই লিখতে পেরেছি। সারা জীবন দশটা কবিতা লিখতে চাই। এখনও নয়টি লেখা বাকি।

এত কিছুর পরেও কবিতার গানটি নিয়ে মানুষের যেন উৎসাহ, উদ্দীপনা আর কৌতুহলের সীমা নেই। বাউলেরা বললো—গুরু, গানাটা বড়ো ছোটো হইনচে, ইট-অ একটু বড়-অ কইরে দ্যান কেনে।

ওদের অনুরোধে কবিতাটি আবার 'লালপাহাড়িরর দেশে যা' নামে আবার লিখতে হলো। সুরটাও পাল্টে দিয়েছি। মানুষের ভালোও লেগেছে।

লালপাহাড়ির দেশে যা
(ঝুমুর, তাল : দাদরা)

হই দ্যাখো গ' তুই ইখানে কেনে
অ তুই লালপাহাড়ির দেশে যা

রাঙ্গা মাটির দেশে যা
হেথাকে তুকে মানাইছে লাই রে
ইক্কেবারে মানাইছে লাই রে
লালপাহাড়ির দেশে যাবি
হাঁড়িয়া আর মাদল পাবি
হেথাকে তুকে মানাইছে লাই রে
নদির ধারে শিমুল গাছ
নানা পাখির বাসা রে, নানান পাখির বাসা
কাল সকালে ফুইট্‌বে ফুল
মনে কতো আশা রে
মনে কতো আশা।
মাইয়া মরদের আদর পাবি
হেথাকে তুকে মানাইছে লাই রে
ইক্কেবারেই মানাইছে লাই রে
ভাদর আশ্বিন মাসে
ভাদু পূজার ঘটা রে, ভাদু পূজার ঘটা
তুই আমারে ভালোবেসে পালিয়ে গেলি
কেমন বাপ্যের ব্যাটা রে, কেমন বাপের ব্যাটা
মরবি তো মরেই যা
ইক্কেবারেই মরে যা
হেথাকে তুকে মানাইছে লাই রে
ইক্কেবারেই মানাইছে লাই রে...

৬. কবিতাটি অসম্ভব জনপ্রিয়তার জন্যে কলকাতার অগ্রজ কবি শঙ্কর মহেশ্বরী হিন্দিতে অনুবাদ করে ব্যাঙ্গালোরের একটি পত্রিকায় ছেপেছিলেন (১৯৮০)। ২০০৮-এর শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় ১৮০০ সাহিত্য স্টলে 'অমিতা সেন মঞ্চে' বোলপুরের এক বাউল হিন্দি অনুবাদের গানটি অসাধারণ দক্ষতায় গেয়ে সবাইকে মোহিত করে দেয় এবং আমাকে প্রণাম করে বলে—'গুরু, সারা ভারতে, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে, রাজস্থানে, বিহারে, ঝাড়খণ্ডে, বাংলা বাউল গানের অনুষ্ঠানে হিন্দি অনুবাদটি গেয়ে বহু মানুষকে আনন্দ দিতে পেরেছি। আরও গান চাই।

৭. গাছটি আজ নেই। ২০০৬ সালে খটখটে শুকনো হয়ে রেলকর্মীর হাতে কাটা পড়েছে। কোটরে বাসা বেঁধেছিল পিপুল আর বটগাছ, তার ওপর টিনের পাতে বড়ো বড়ো পেরেকে গাঁথা ঋতুবন্ধের বিজ্ঞাপনের অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি। শ্রীরামপুরের মেয়র, বন্ধু সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও কবি সমর মুখোপাধ্যায় চেষ্টা করেছিল পেরেক উপড়ে ফেলতে। পারেনি। এখন এক গভীর শোকে প্রতিদিন আচ্ছন্ন হয়ে আছি।

প্রতিদিন সারা পৃথিবীতে 'লালপাহাড়ি' নিয়ে কত কি যে ঘটে যাচ্ছে, সব খবর পাই না। কিছু কিছু পাচ্ছি, তাই-ই জানাচ্ছি।

'লালপাহাড়ি' নিয়ে একটি গবেষণামূলক film হয়েছে। Director : Spandan Banerjee, OVERDOZE FILM, New Delhi, Premier Show হয়েছে New York-এ, দিল্লিতে, এবার দিল্লির জাতীয় ফিল্ম ফেস্টিভালে Special Merit National Award পেয়েছে। U-Tube বা google খুলতে দেখা যেতে পারে, Washington D.C. Channel-এ দেখা যেতে পারে।

৮. ২০১২ সালে কবিতাটির রচনার ৪০ বছর পূর্ণ হলো। একমাত্র বিখ্যাত গায়িকা উষা উত্থুপ ছাড়া আর কেউ-ই স্বীকার করেনি। 'প্রচলিত' বলে বারবার প্রচার হয়েছে। ভূমি ব্যাণ্ড নিজেদের গান বলে প্রচার করেছে। স্বীকৃতি দেয়নি। কোনো পয়সাকড়িও দেয়নি, কোনো CD বা ক্যাসেটেও রচয়িতার নাম দেয়নি। কলকাতার সহজিয়া ফাউণ্ডেশনের প্রাণপুরুষ ও গায়ক দেব চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় ৬ জুলাই কলকাতার রবীন্দ্রসদনে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা শ্রী অনুপ মতিলাল মহাশয় আমাকে সহজিয়া সম্মান প্রদান করলেন। এই প্রজন্মের বিখ্যাত ব্যাণ্ড ও মানুষজন উপস্থিত ছিলেন, গানও গাইলেন। আনন্দের কথা, মনসুর ফকির ও কালাচাঁদ দরবেশ উপস্থিত থেকে গান পরিবেশন করেন উৎসবের মেজাজ সহজিয়া সুরে মাতাল হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রসদন। কলকাতা এই উৎসব প্রথম দেখলো, ৪০ বছরের একটি অতি জনপ্রিয়, পৃথিবীময় প্রচারিত গানের স্বীকৃতি। মানুষের জন্যে লিখি। মানুষই গানটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে চল্লিশ বছর ধরে। দেবু বলেছে, গানটির ৫০ বছরও পালন করা হবে।

৯. অমর্ত্য সেন মহাশয়ের মা শ্রীমতী অমিতা সেন প্রতীচীতে বারবার শুনতে চাইতেন কবিতাটি আর গানটি। কবি শক্তি চট্টোপধ্যায়ের নিবিড়ঘন মদ্যপানের আসরে বারবার গাইতে হত। শক্তিদা ধেই ধেই করে নাচতো, সে এক অন্য মজা। সুনীলদা, স্বাতী বউদিও নাচতো।

১০. সম্ভবত আমার ও আমাদের সঙ্গে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ অনুষ্ঠান, কবি সুজিত দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে। সঙ্গে ছিলেন ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ সরকার, শঙ্কর চক্রবর্তী, সুজিত দাস। সুনীলদা প্রথমেই উল্লেখ করলেন, সস্নেহে বললেন—'অরুণের কাছে আমার ঋণ রয়ে গেল। অরুণের 'লালপাহাড়ি' কবিতাটি আমি 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে ব্যবহার করেছি। তখন জানতাম না বলে অরুণের নাম উল্লেখ করতে পারিনি। আমি শান্তিনিকেতনের বাউলদের মুখে শুনেছিলাম। ভাল লেগেছিল। এবং যথাস্থানে গানটি উপন্যাসে ব্যবহার করেছি।'

সুনীলদা আরও বললেন—'সবাই আমার বাড়ি গেছে, কেবল তুমিই যাওনি। একদিন চলে এসো, আড্ডা দেয়া যাবে, গান শোনা যাবে।

আমি বলেছিলাম, '১৩ তলা, সে তো আকাশে!

তিনি হেসেছিলেন।

যাবো যাবো করে আর যাওয়া হয়নি। সুনীলদা ১৩ তলা ছেড়ে আকাশের কত নম্বর তলায় চলে গেলেন, বলে গেলেন না! ❑